হাসান আজিজুল হকের গল্পে শ্রেণিচেতনা ও শ্রেণিসংগ্রামের রূপায়ণ

মোহাম্মদ সাকিবুল হাসান*

[সারসংক্ষেপ : হাসান আজিজুল হক ছাত্রজীবন থেকেই প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। সঙ্গত কারণেই খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের জীবন-কথা তাঁর গল্পের উপাদান হয়েছে। তাদের অপ্রাপ্তি, বঞ্চনা, আর্তি, হাহাকারের বিরুদ্ধে লড়াই, প্রতিবাদ-প্রতিরোধের চিত্র প্রকাশিত হয়েছে তাঁর গল্পে। গ্রামবাংলার শোষিত, নিপীড়িত, নির্যাতিত ও নিরন্ন মানুষের জীবন-চিত্রায়ণের এক সার্থক রূপকার তিনি। মৃত্তিকালগ্ন মানুষের সংগ্রামী জীবনের তিনি এক নিপুণ কথাকার। এইসব মানুষের কথা বলতে গিয়ে তিনি তাদের ভেতরকার দ্বন্দ্বময় সংগ্রাম ও অস্তিত্ব-অভীপ্সাকে শ্রেণিসংগ্রামের আলোকে শিল্পমণ্ডিত করে তোলেন। ফলে শ্রেণিসংগ্রামের বৈচিত্র্যময় ঘটনা ঘনিষ্ঠরূপ লাভ করেছে তাঁর গল্পে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে হাসান আজিজুল হকের প্রাসঙ্গিক গল্পের আলোকে শ্রেণিচেতনা ও শ্রেণিসংগ্রামের স্বরূপ উন্মোচনের প্রয়াস থাকবে।]

একটি সুষম, ন্যায়, মুক্ত এবং সর্বসাধারণের জন্য সুখী-সমৃদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন যুগ যুগ ধরে মানুষ লালন করে আসছে। কিন্তু সমাজ শাসনের প্রতিটি পর্যায়েই মানুষ দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল – একভাগে শাসক আর অন্যভাগে শাসিত। শাসিতদের শোষণ করেই শাসকশ্রেণি যুগ যুগ ধরে বিলাসী জীবনযাপন করে আসছে। সময়ের ধারাবাহিকতায় কেবল শাসনের ধরন পাল্টেছে, কিন্তু শোষণের রকমফের হয়নি কখনো। দাসযুগ ও সামন্তযুগের সঙ্গে একালের পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার শোষণের ধরনে কোনো রকমফের নেই। সমাজ-বিকাশের প্রতিটি যুগেই উৎপাদন ব্যবস্থায় একইসঙ্গে দুইটি পরস্পর বিরোধী শ্রেণির অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। যুগে যুগে পৃথিবীর অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ শাসক ও শোষিত শ্রেণির মধ্যকার দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের অবসান ঘটিয়ে একটি বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছেন। নিপীড়িত মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, অধিকারহীনতা তাঁদেরকে মর্মাহত করেছে। শোষিত মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থার প্রতি যেমন তাঁরা অনাস্থা জ্ঞাপন করেছেন, তেমনি কখনো কখনো শোষিত জনগণকে অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে অধিকার প্রতিষ্ঠা করার মন্ত্রে করেছেন উজ্জীবিত। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় শাসকশ্রেণির শোষণের হাত থেকে শ্রমিকশ্রেণির মুক্তির দিশারিরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩); যাঁর চিন্তাধারা মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির ইতিহাসে পৃথিবীর তাবৎ মুক্তিকামী মানুষকে ব্যাপকভাবে আলোড়িত ও উদ্দীপিত করেছে। তাঁর আগেও মানুষের মুক্তির জন্য অনেকেই নানা তত্ত্ব, মতবাদ হাজির করেছেন; কিন্তু কেউই একটি শোষণহীন, শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত পথ দেখাতে পারেননি। এক্ষেত্রে কার্ল মার্কস বিশেষ ব্যতিক্রম, যিনি সমাজ বিকাশের সমস্ত পূর্বতন অভিজ্ঞতা, মতবাদ ও ধ্যান-ধারণা বিচার-বিশ্লেষণ করে একটি নবতর বৈপ্লবিক ও

*সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রণয়ন করেন– যা মার্কসবাদ নামে পরিচিত। একটি শোষণমুক্ত ও শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। কার্ল মার্কস যে উপায়ে মানবতার মুক্তির পথ অন্বেষণ করেছেন তাই মূলত কমিউনিজম বা সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্র কেবল একটি সমাজকাঠামোই নয়, এটি মানুষের মুক্তির এক সামগ্রিক জীবনদর্শন। মার্কসীয় দর্শন শুধু মানবজীবনের উত্থান-পতনের বস্তুগত দিক নিয়েই আলোচনা করে না; তার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কেও আমাদেরকে অবগত করে। কার্ল মার্কস মানবমুক্তির তাত্ত্বিক দিক উপস্থাপন করেই ক্ষান্ত হননি, রাজনৈতিকভাবে তা বাস্তবায়নের কথাও বলেছেন। অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে শোষিত মানুষকে জাগিয়ে তোলাই মার্কসীয় দর্শনের মূল লক্ষ্য। তাঁর মতে, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় বিদ্যমান মালিকশ্রেণি ও শ্রমিকশ্রেণির মধ্যকার বৈষম্যের অবসান ঘটানো সম্ভব কেবল শ্রমিকশ্রেণির জাগরণের মধ্য দিয়ে। পুঁজিবাদী সমাজে একজন শ্রমিককে তার শ্রমের জন্য যে মজুরি প্রদান করা হয় তা তার শ্রমের থেকে অনেক কম। শ্রমিক যা মজুরি পায় তার চেয়ে অনেক বেশি উৎপাদন করে পুঁজিপতির জন্য; কিন্তু সেই ভাগ সে পায় না। সেটা চলে যায় পুঁজিপতির পকেটে। পুঁজিপতি পরিশ্রম না করেও পুঁজির মালিক হয়, শ্রমিকের শ্রম চুরি করে গড়ে ওঠে তার সম্পদের পাহাড়। কিন্তু শ্রমিক জানে না তার শ্রম চুরি করেই মালিকের সম্পদ পাহাড়-সমান হয়েছে এবং সে সম্পদের উৎপাদক তারাই। সমাজে তাদের এই ভূমিকা উপলব্ধি করতে পারাই হলো শ্রেণিচেতনা। শ্রেণিচেতনা ছাড়া শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা তথা সমাজবিপ্লব ও সমাজতন্ত্রে উত্তরণ কোনোটাই সম্ভবপর হবে না। কার্ল মার্কস তাই সমাজবিপ্লবের অপরিহার্য শর্ত হিসেবে শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে চেতনার জাগরণ ঘটানোর কথা বলেছেন। যখন শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে শ্রেণিচেতনা জাগ্রত হবে কেবল তখনই শ্রেণিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। মার্কসীয় দর্শনে মানবমুক্তির স্বরূপ সম্পর্কে একজন সমালোচকের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> উৎপাদন শক্তির সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্কের দ্বন্দ্ব আর তার প্রতিফলন ঘটে শ্রেণিসংগ্রামে – যার পরিণতিতে বিপ্লব ও নতুন সমাজের অভ্যুদয়। মার্কস কল্পিত সেই সমাজব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হবে কৃষক-শ্রমিকের অধিকার। শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে যে সমাজব্যবস্থা জন্ম নেবে সেখানেই পাবে সাম্য ও স্বাধীনতার স্বরূপ। (হাফিজুর, ২০২১ : ৩৭)

সময় ও সমাজকে অনুধাবনের স্বাতন্ত্র্যই একজন লেখককে আরেকজন থেকে পৃথক করে দেয়; সেই সঙ্গে যুক্ত হয় লেখকের ব্যক্তিগত জীবনবোধ, ইতিহাসজ্ঞান ও রাজনৈতিক দর্শন। ইতিহাস, সময় ও সমাজ – এই ত্রয়ী উপকরণের সংমিশ্রণেই গড়ে ওঠে একজন লেখকের সামগ্রিক জীবনজিজ্ঞাসা। এই জীবন যেমন সময়ের সঙ্গে সংযুক্ত, তেমনি সমাজ ও ইতিহাসের সঙ্গেও। সমাজ ও মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতার জন্যই হাসান আজিজুল হক (১৯৩৯-২০২১) মার্কসীয় জীবনাদর্শে বিশ্বাস স্থাপন করে শোষিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত, নিরন্ন, অসহায় মানুষের পক্ষে লেখনী ধারণ করেছেন। তাঁর গল্প পাঠ করলে স্পষ্টত দুই শ্রেণির মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় – শোষক ও শোষিত; এবং এই দুই শ্রেণির মানুষের দ্বন্দ্ব-সংক্ষোভে এগিয়ে যেতে থাকে তাঁর গল্পের কাহিনি। যেহেতু তিনি মার্কসীয় রাজনীতিতে বিশ্বাসী, সেহেতু শেষ পর্যন্ত শোষিত মানুষের মুক্তির পথনির্দেশই হয়ে ওঠে তাঁর গল্পের পরম আরাধ্য। তাঁর গল্পে কখনো শোষকের নির্মম আঘাতে নিষ্পেষিত হয় সাধারণ মানুষের জীবন এবং অমোঘ নিয়তির মতো সেটাকে মেনে নিয়েই তাদেরকে টিকে থাকতে হয়; আবার কখনো শেষিত মানুষ সংঘবদ্ধ হয়ে শোষকের বিরুদ্ধে গড়ে

তোলে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ, প্রবল সাহস ও প্রত্যয়ের সঙ্গে শ্রেণিশত্রুকে করে দিতে চায় নিশ্চিহ্ন। এতে যে লেখকের ব্যক্তিগত জীবনাদর্শের প্রতিফলন ঘটে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এ-প্রসঙ্গে হাসান আজিজুল হকের সাহিত্যিক-মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে একজন সমালোচকের বক্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে : "হাসান একজন সমাজবাদী লেখক, তিনি শোষিত ও নিপীড়িত জনগণের পক্ষ নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করেন। এদের শ্রেণি শত্রুদের সঙ্গে হাসানের কোনো আপোস নেই।" (আবু জাফর, ১৯৯৯ : ১৩)

দেশ ও মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সচেতনতা হাসান আজিজুল হকের স্রষ্টাচৈতন্যকে করেছে গতিশীল, সজীব ও প্রাণবন্ত। প্রান্তিক শ্রেণির মানুষের আশা-নিরাশা, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনা তাঁর গল্পে উঠে এসেছে। প্রগতিশীল জীবনভাবনা, সমাজ ও রাজনীতি সচেতনতা, সামাজিক অবক্ষয়, শোষিত মানুষের হাহাকার, প্রতিবাদ-প্রতিরোধের কাহিনি বিধৃত হয়েছে তাঁর গল্পে। সাম্যবাদী সমাজ-ভাবনায় বিশ্বাসী হাসান আজিজুল হক অন্যায়, জুলুম, নির্যাতন, নিপীড়ন, শোষণ, বঞ্চনার বিপরীতে একটি সুষম সমাজের প্রত্যাশা করেন। মার্কসীয় তত্ত্ব সম্পর্কে লেখক এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন :

> মার্কসীয় তত্ত্ব আমাদের অন্তহীন প্রশ্ন এবং জিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়, আমাদের চিন্তার সঙ্গে কাজের সাযুজ্য ঘটায়, নিজে না-জড়িয়ে দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখা বন্ধ করে দেয়, উত্তপ্ত জীবনপ্রবাহের মাঝখানে ফেলে দিয়ে সুনির্দিষ্ট অবস্থান নিতে আমাদের বাধ্য করে। (হায়াৎ, ২০১১ : ১০২)

হাসান আজিজুল হক ছাত্রজীবন থেকেই প্রগতিশীল ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি ছাত্র ইউনিয়নে যোগদান করেন। তিনি দৌলতপুর কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন ১৯৫৭ সালে। অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার তাঁর গল্পের পরতে পরতে তাই নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে। তিনি সমাজবিকাশের মার্কসবাদী ব্যাখ্যায় বিশ্বাসী। সাহিত্যকে তিনি সমাজ সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করেন। প্রান্তিক শ্রেণির মানুষের দারিদ্র্য ও সামাজিক বৈষম্য, তাদের অভাব ও অসহায়ত্ব দেখে তিনি আবেগতাড়িত হয়েছেন এবং সেই অবস্থার পরিবর্তন করে একটি সুষম সমাজ সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন। মহীবুল আজিজকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন :

> আমি বিশ্বাস করি যে, একমাত্র মার্কস্‌বাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করলেই সমাজের ইতিহাসটাকে, সমাজের বর্তমান অবস্থাটিকে এবং সমাজ-বাস্তবতাকে পরিপূর্ণভাবে এবং সবচাইতে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা যায়, বোঝা যায়। ঐ অর্থেই আমার মার্কস্‌বাদে বিশ্বাস। (হায়াৎ, ২০১১ : ১০২)

হাসান আজিজুল হক তাঁর গল্পে নিপীড়িত মানুষের উত্থানের কাহিনি বর্ণনা করেন, স্বীয় প্রতিভার দ্যুতিতে শোষিত মানুষকে নবতর জীবনচেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে চান। ফলে তাঁর গল্প হয়ে উঠেছে শোষকের বিরুদ্ধে শোষিত মানুষের সম্মিলিত জাগরণের ইতিবৃত্ত। কারণ, তিনি জানেন, শোষকের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারলে এবং শ্রেণিশোষণের বিলোপসাধন করতে না পারলে নিপীড়িত মানুষের মুক্তি অধরাই থেকে যাবে। তিনি শোষিত মানুষের মুক্তি কামনা করেন। সমাজে বিদ্যমান সীমাহীন বৈষম্য, দারিদ্র্য, শোষণ-পেষণের অবসান চান তিনি। সঙ্গত কারণেই "বস্তুবাদী জীবনদৃষ্টির আলোয় তিনি উন্মোচন করেছেন সমাজজীবনের বহুমাত্রিক

অবক্ষয়, শোষিত-ক্লিষ্ট মানুষের হাহাকার ও বঞ্চনা, কখনো-বা তাদের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের কাহিনী" (বিশ্বজিৎ, ২০০৯ : ১৮৪)। মার্কসীয় আদর্শে বিশ্বাসী হাসান আজিজুল হকের গল্পে শ্রেণিচেতনা ও শ্রেণিসংগ্রামের শৈল্পিক প্রকাশ লক্ষ করা যায়। মার্কসীয় রাজনীতির প্রতি গভীর বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও তাঁর গল্প মার্কসীয় চিন্তার ধারাভাষ্য হয়ে উঠেনি, বরং মানবিক প্রকাশের অনবদ্য ব্যঞ্জনায় তা হয়ে উঠেছে স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত। তাঁর কিছু গল্পে শ্রেণিচেতনা ও শ্রেণিসংগ্রামের রূপায়ণ ঘটেছে মুখ্যভাবে, আর কিছু গল্পে এসেছে গৌণভাবে।

'শকুন' গল্পে হাসান আজিজুল হক প্রতীকী ব্যঞ্জনায় তুলে ধরেছেন গ্রামীণ সুদখোর মহাজনের প্রকৃত স্বরূপ। মৃত শকুন ও মৃত শিশুকে পাশাপাশি রেখে তিনি অবক্ষয়িত ধূসর সমাজবাস্তবতার চিত্রই অঙ্কন করেছেন। শকুনটিকে সুদখোর মহাজনের চেহারার সাথে একাত্ম করে দিয়ে হাসান আজিজুল হক মূলত গ্রামের শোষিত, নিপীড়িত মানুষের পক্ষেই সুস্পষ্টভাবে তাঁর অবস্থানের কথা জানিয়ে দেন। হাসান আজিজুল হক তাঁর শৈশবকাল থেকেই গ্রামীণ জীবনের এইসব অন্যায়-নিপীড়ন, শোষণ-বঞ্চনা সম্পর্কে সম্যক অবগত। সে-অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি এই প্রতীকী পরমার্থমণ্ডিত গল্পটি রচনা করেন অসাধারণ দক্ষতায়; এবং দেখিয়ে দেন কী অসামান্য দক্ষতায় গ্রামের রাখাল আর স্কুলপড়ুয়া ছেলেদের মিলিত সমবায়ে গঠিত দলটি শোষণ বিনাশে তৎপর হয়ে ওঠে। তারা নিজেরাও এই শোষণ প্রক্রিয়ারই অংশ। এজন্যেই শকুনটাকে দেখলেই তাদের গ্রামের সুদখোর মহাজন অঘোর বোষ্টমের কথা মনে পড়ে। সুদখোর মহাজনের সঙ্গে শকুনের সাদৃশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন :

> ছেলেদের কথায় শকুনটাকে দেখে তাদের রাগ লাগে, মনে হয় তাদের খাদ্য যেন শকুনের খাদ্য, তাদের পোশাক যেন ওর গায়ের গন্ধভরা নোংরা পালকের মত; সুদখোর মহাজনের কথা মনে হয় ওকে দেখলেই। নইলে মহাজনকে লোকে শকুন বলে কেন। [...] জামু বলল, সব শালোর হাঁফানির ব্যায়রাম। ওরে শালা, পালাইতে চাও, শালা শিকুনি, শালা সুদখোর অঘোর বোষ্টম। (হাসান, ২০০১ : ১৮)

দুরন্ত গ্রামীণ কিশোর কর্তৃক শকুনটাকে আহত রক্তাক্ত করার কারণ হলো – তাকে সুদখোর মহাজনের মতো দেখায়। তারা শকুনটির শরীর থেকে নির্মমভাবে পালক খুলে নেয়। তারপর রক্তাক্ত অবস্থায় শকুনটাকে রেখে তারা বাড়ি ফিরে আসে। ফেরার সময় জমিরদ্দি ও কাদু শেখের বিধবা বোনকে আবছা অন্ধকারে দেখতে পায় কিশোর দলটি। পরের দিন সকালবেলা শকুনটা মৃত পড়ে থাকে আর তারই পাশে পড়ে থাকে কাদু শেখের বিধবা বোনের অবৈধ মৃত সন্তান। আর সেই মৃত শিশুটাকে দেখার জন্য আশপাশের বাড়িঘর থেকে মানুষজন ছুটে আসছে কিন্তু সেখানে কাদু শেখের বিধবা বোনের দেখা মেলে না। কারণ "সে অসুস্থ। দিনের চড়া আলোয় তাকে ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে।" (হাসান, ২০০১ : ২১)

এই গল্পে শোষক এবং শোষিতের অবস্থানটি সুস্পষ্টভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন লেখক। শোষণ, নিপীড়নের ফলে সমাজের ভেতরকার কাঠামোটি কীভাবে অধঃপতন, অবক্ষয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছাতে পারে কাদু শেখের বিধবা বোনের অবৈধ মৃত শিশুটি তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। মৃত শকুনটির পাশে পড়ে থাকা শিশুটিকে খাবার জন্য দলে দলে শকুন নামছে। গল্পকার জানিয়ে দেন : "শকুন শকুনের মাংস খায় না" (হাসান, ২০০১ : ২১)। কিন্তু মানুষরূপী শোষক-মহাজনরা ঠিকই

মানুষকে অধিকার বঞ্চিত করে টাকার পাহাড় গড়ে তোলে। তাই অধিকার বঞ্চিত মানুষ শেষাবধি সংগ্রামের পথ বেছে নেয় প্রাপ্য অধিকারের হিস্যা আদায়ের জন্য এবং গল্পকারও হয়ে যান বঞ্চনাপীড়িত মানুষের প্রতিনিধি। গল্পটি সম্পর্কে সমালোচকের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য : "প্রতীকধর্মী এ গল্পে হাসান আজিজুল হক যেমন শোষককে চিহ্নিত করে তার বিনাশ, ধ্বংস সংঘটিত করেছেন তেমনি এটাও দেখিয়েছেন যে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় যে কোন শোষণের অবসান ঘটানো সম্ভব" (সরিফা, ২০১০ : ৮৫)। 'শকুন' গল্পে হাসান আজিজুল হক নির্মোহ দৃষ্টিকোণ থেকে যেমন বিশ্লেষণ করেছেন সামাজিক অবক্ষয়ের চিত্র, তেমনি শোষকের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে রুখে দাঁড়ানোর বয়ানও করেছেন তিনি। গ্রামীণ কিশোরদল কর্তৃক শকুনটাকে রক্তাক্ত করার মধ্য দিয়ে হাসান আজিজুল হক শোষকদের এই বার্তাটি জানিয়ে দেন যে, তাদের পরিণতি হবে শকুনের চেয়ে আরও ভয়াবহ। শকুনসদৃশ কোনো জোতদার শোষক, মহাজনকে শোষিত মানুষ আর ছাড় দেবে না।

'আমৃত্যু আজীবন' গল্পে করমালি চরিত্রের মধ্য দিয়ে গল্পকার শোষিত মানুষের সীমাহীন দারিদ্র্য ও বঞ্চনার চিত্র অঙ্কন করেছেন। করমালির মত নিম্নশ্রেণির মানুষেরা সারাজীবন অভাব, দারিদ্র্য, শোষণ, বঞ্চনা, বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যায় কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয় না। ভাগের জমিতে চাষ করে করমালি স্বীয় মাতা, স্ত্রী ও পুত্রকে নিয়ে কোনো রকমে জীবন চালিয়ে যায়। একপর্যায়ে প্রকৃতি যেন তাদের জীবনসংগ্রামের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। শোষণ ও বঞ্চনাই যেন করমালিদের বিধিলিপি। কারও বিরুদ্ধে এদের কোনো অভিযোগ নেই, যত বাধা-বিপত্তিই আসুক না কেন সবকিছুকে দুহাতে ঠেলে সামনে এগিয়ে যায় কেবল পরিবার-পরিজন নিয়ে দুমুঠো খেয়ে-পরে থাকার জন্য। কিন্তু সর্পরূপী শোষকের সর্বগ্রাসী থাবায় করমালির জীবনে নেমে আসে ঘোর অন্ধকার। এই দুর্জ্ঞেয় অন্ধকারের বিরুদ্ধে টিকে থাকার জন্য করমালির যে অভিযাত্রা, তার শক্তি ও সাহস সে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে এবং তারই সংগ্রামী উত্তরাধিকার বহন করে রহমালিকেও এই কঠিন জীবনযুদ্ধে লড়াই করে বেঁচে থাকতে হবে যুগপৎ প্রাকৃতিক ও সমাজসৃষ্ট প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে। কোনো বাধাবিঘ্নই তাদের আটকাতে পারে না, দ্বিগুণ সাহস ও শক্তিতে সামনে এগিয়ে যায়। করমালি জানে বেঁচে থাকতে হলে লড়াই করতে হবে। কারণ, পৃথিবীটা পরাজিত মানুষের জন্য নয়। তাই বিশ বছরের পুত্র রহমালিকে সঙ্গে নিয়ে করমালি যখন বিলসংলগ্ন পতিত জমিটার সংস্কার করতে গিয়ে পাঁচহাত দূর থেকে বিরাট ফণাযুক্ত একটি সাপ দেখছিল, তখন তার মধ্যে কোনো ভয়, শঙ্কা কিংবা উদ্বেগ – কোনো ভাবেরই উদ্রেক হয়নি। এইসব বাধা বিপত্তি যেন তার কাছে চিরচেনা। এই প্রকৃতিসৃষ্ট প্রতিকূলতাকে মেনে নিয়েই তাকে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। গোখরা সাপটি করমালির ভেতরকার সংগ্রামী ভাবনার স্বরূপটিই যেন উন্মোচন করে। গল্পকারের বর্ণনায় :

> আশঙ্কা ঘৃণা বিবমিষা ভীতি স্নেহ বা ভালোবাসা কোন পরিচিত মনোভাবই জন্ম নিল না তার মধ্যে। কেবল সে তার ভাগ্যকে নিয়তিকে তার সংগ্রামকে – যে সংগ্রামে অন্ত নেই, উত্তেজনা নেই এবং যে সংগ্রামে বারবার পরাজয় এসে করমালির সাহস দেখে লজ্জা পায় – সেই সংগ্রামকে প্রত্যক্ষ করল। (হাসান, ২০০১ : ১৮৯)

সাপটি তার ছাতার মতো উজ্জ্বল ফণা তুলে করমালির সমগ্র অস্তিত্বকে যেন গ্রাস করতে চায়। কিন্তু করমালি সহজে পরাজয় মেনে নেবার পাত্র নয়। সমস্ত শক্তি দিয়ে সে মোকাবিলা করতে চায় অশুভ

শক্তিকে। সাপটি করমালির মধ্যে একটা বোধের জন্ম দেয়, যে বোধের নাম সে জানে না। প্রকৃতপক্ষে এ-বোধটি যে তার অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রাম তা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না। সিনেমার দৃশ্যের মতো একের পর এক তার সামনে উন্মোচিত হতে থাকে সাপের সর্বগ্রাসী রূপটি, যা করমালির মতো অসহায় মানুষের অলঙ্ঘনীয় বিধিলিপি। এই বিধিলিপিকে খণ্ডনের জন্য তারা সংগ্রাম করে যায় আজীবন। করমালির সেই সংগ্রামী মানসিকতাকে লেখক তুলে ধরেছেন এভাবে :

> একটি মাত্র বোধ তীক্ষ্ণ হুলের মত করমালির চেতনায় বেঁধে আছে, যে-বোধের কোন নাম নেই। [...] তার বিস্ফারিত চোখের সামনে আশপাশের বড় বড় গাছগুলোর মাথা ছাড়িয়ে উঠে গেল ওর মাথা, একটা বড় পুকুরের মতো রূপ নিয়ে দেখা দিল তার মাথায় আঁকা গোক্ষুরটি। এইভাবে করমালি নিমেষে আবৃত হলো তার সংসার সাধ বাসনাসহ। তার ফণার নিচে বলশালী অন্ধকারের দাঁত কড়কড় করে ওঠে এবং গ্রামের মানুষের ভেঙে-পড়া, ঘুণধরা অথচ ঈশ্বরের মত অমোঘ সংগ্রামকে গ্রহণ এবং মুহূর্তে চিবিয়ে যেন গুঁড়ো করে ফেলে। (হাসান, ২০০১ : ১৮৯-৯০)

জমিতে গোখরো সাপ দেখার পর কাজ-শেষে বাড়ি এসে করমালি শোনে তার তরুণ পুষ্ট ধলা বলদটা সর্পদংশনে মারা গেছে। তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। একমাত্র পুত্র রহমালির চেয়েও এই ধলা বলদ তার কাছে বেশি দামি। এর চেয়ে রহমালি মারা গেলেও সে মানতে পারত কিন্তু যে বলদ তাদের বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন তাকে হারিয়ে করমালি দিশেহারা হয়ে পড়ে। কারণ, ভাগে জমি চাষ করতে না পারলে না খেয়ে তাদের মরতে হবে। করমালির সামনে কেবল অন্ধকার। কিন্তু ভেঙে পড়ে না সে। স্ত্রী ও ছেলে দুজনই জমি চাষের জন্য লাঙল টানার প্রস্তাব দেয় তাকে। সে কারো সাহায্য গ্রহণ করে না। জীবনের এই কঠিন সময়কে সে জয় করতে চায় সাহসের সাথে। তাই কারো সাহায্য না নিয়ে পরদিন রহমালিকে নিয়ে আবার সেই জমিতে যায় কিন্তু সাপটিকে মারতে গিয়ে ব্যর্থ হয় রহমালি। তখন করমালি বলে : "কেউ মারতি পারে না। ওরে মারা যায় না কোনদিন" (হাসান, ২০০১ : ২০২)। কারণ, করমালি তার যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছে এই শক্তিকে বিনাশ করা যায় না কখনো, দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তির মতো জুড়ে থাকে জীবনের প্রতিটি স্তরে। তবুও করমালি এই অলঙ্ঘনীয় নিয়তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যায়। গ্রামের সকলে মিলে সাপটিকে মারবার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়। শোষকরূপী সাপের বিরুদ্ধে শোষিত-নিপীড়িত-বঞ্চিত গ্রামবাসী ঐক্যবদ্ধ হয়। তাদের এই প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে হাসান আজিজুল হক শ্রেণিশোষকের বিরুদ্ধে গ্রামবাসীর মধ্যে জাগ্রত শ্রেণিচেতনাকেই যেন তুলে ধরেছেন প্রতীকী ব্যঞ্জনায়। এ প্রসঙ্গে গল্পের প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃতিযোগ্য :

> তারা কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ না হয়ে কেবলমাত্র তাদের সংকল্পকে সংঘবদ্ধ করতে থাকে, তাদের চেতনাকে বল্লমের ফলার মতো তীক্ষ্ণ করে নিয়ে আসে এবং সকাল আসার সঙ্গে সঙ্গে যেভাবে একসঙ্গে মাঠের কাজে বেরোয়, দিনমজুরের কাজে যায়, যেভাবে একসূত্রে বাঁধা থেকে যাবতীয় সংস্কারের পরিচর্যা করে, গ্রামীণ জীবনের আদিমতাকে টিকিয়ে রাখে, লাঙল গরু, হাতিয়ার ইত্যাদির বিবর্তন ঘটতে দেয় না-ঠিক সেই একই রকম জোট বাঁধার নমুনায় তারা করমালি এবং রহমালিকে বাড়ি থেকে জমির দিকে ডেকে নিয়ে যায়। দেরি করলি চলবে না নে – ওডারে শ্যাষ করে যে যার কাজে যাবানে। (হাসান, ২০০১ : ২০৩)

কিন্তু সাপটিকে মারবার জন্য গ্রামবাসীর সম্মিলিত প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। গ্রামবাসী কর্তৃক সর্পনিধনের এই ব্যর্থতা শোষিত মানুষের অন্তর্নিহিত বাস্তবতাকেই নির্দেশ করে। অবশ্য সাপটিকে মারবার জন্য গ্রামবাসী প্রথমে যে স্পৃহা নিয়ে এগিয়ে এসেছিল অল্প কিছুক্ষণ পরেই তা উবে যায়; তাদের ঐক্যে ফাটল ধরে, বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সম্মিলিত প্রতিরোধের মূল চেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে গ্রামবাসী। ফলে তাদেরকে হারাতে হয় চৌদ্দ বছরের ছেলে সাদেককে। করমালির ভাবনায় শোষকের বিরুদ্ধে সম্মিলিত সংগঠিত প্রতিরোধের চেতনা জাগ্রত হতে থাকে। এ প্রসঙ্গে একজন সমালোচক যথার্থই বলেছেন : "জীবনের প্রবাহের সঙ্গে নিঃশব্দে বয়ে যাওয়া সেই শক্তি সম্পর্কে করমালি সচেতন হচ্ছে এবং তার বিরুদ্ধে সে সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পেরেছে" (মহীবুল, ২০১১ : ৬৪)। কিন্তু করমালির শেষ রক্ষা হয়নি, প্রাকৃতিক বৈরিতার ফলে তাকে মৃত্যুকে বরণ করে নিতে হয় কিন্তু পরাজয়কে মেনে নেয়নি জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত। মহাজনের কাছে তিনশত টাকায় জমি বন্ধক রেখে বলদ কিনে ভাগের জমি চাষ করতে চেয়েছিল সে। কিন্তু প্রকৃতি ও সমাজ দুইই যেখানে তার প্রতিকূলে সেখানে করমালির মতো সামান্য এক কৃষকের জীবনযুদ্ধে টিকে থাকার জন্য সংগ্রাম ছাড়া আর কীই বা করার আছে। যে সংগ্রামের বীজমন্ত্র উত্তরাধিকারসূত্রে সে পেয়েছিল তার পিতার কাছ থেকে, সেই বীজমন্ত্র ছেলে রহমালির মধ্যে সঞ্চারিত করে যায় করমালি। এ সম্পর্কে সমালোচক যথার্থই বলেছেন : "*আমৃত্যু আজীবন* গল্পে লেখকের মার্কসবাদী চেতনার প্রতিফলন স্পষ্ট। শ্রেণিশোষকের প্রতীক গোক্ষুরটির বিরুদ্ধে করমালির লড়াই এবং তার মৃত্যুতে ছেলে রহমালির দায়িত্ব গ্রহণের মধ্য দিয়ে আদিঅন্তহীন শ্রেণিসংগ্রামের প্রতীকায়ন ঘটে" (চন্দন, ২০১৯ : ২২০)। করমালি তার সারাজীবন ধরে প্রচণ্ড লড়াই করেছে। তার জীবনের ইতিহাস সকল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রামশীলতার ইতিহাস। সেক্ষেত্রে করমালির সংগ্রাম মানুষের চিরকালীন জীবনযুদ্ধেরই নামান্তর, যেখানে প্রতি মুহূর্তে তাকে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হয় সর্পরূপী শ্রেণিশোষক আর বৈরী প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। বার বার পরাজয় এসে তার জীবনকে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছে, কিন্তু তার চেয়ে বেশি শক্তি ও সাহসে পুনরায় জীবনযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সে।

'শোণিত সেতু' গল্পে হাসান আজিজুল হক তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ঘটনাকে একটি অভিন্ন লক্ষ্যে স্থাপন করেছেন। মূলত এই তিনটি ঘটনার মধ্য দিয়ে লেখক শোষিত, বঞ্চিত, প্রান্তিক শ্রেণির মানুষের ভেতরকার প্রতিরোধ প্রবণতাকেই তুলে ধরেছেন। হাসান আজিজুল হক জানেন, শোষণের হাত থেকে সাধারণ মানুষের মুক্তির একমাত্র পথ হলো সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তোলা। কিন্তু খেটে খাওয়া এইসব প্রান্তিক জনসাধারণ অসংগঠিত হবার কারণে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়। ফলে শোষকেরা বহাল তবিয়তে শোষণকার্য চালিয়ে যায়। তাই হাসান আজিজুল হক এই গল্পে তিনটি ভিন্নধর্মী ঘটনাকে একটি অভিন্ন লক্ষ্যে স্থাপন করে গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে সংঘবদ্ধ সংগ্রামী মানসিকতার সঞ্চার করেছেন অত্যন্ত সফলভাবে। ঘটনা তিনটি হলো :

ক. ষাঁড়ের লড়াইয়ে গ্রামের ধর্মের ষাঁড় মানিকের হাতে বিদেশি ষাঁড় অবলাকান্তের পরাজয়;
খ. বিশ বছর ধরে হাঁপানি রোগাক্রান্ত নিশানাথের সুস্থ হয়ে ওঠা;
গ. গ্রামবাসীর সম্মিলিত প্রতিরোধের কারণে শহুরে ব্যবসায়ী কর্তৃক ফসল কেটে নিতে না পারা।

মূলত এই তিনটি ঘটনার মধ্য দিয়ে হাসান আজিজুল হক প্রান্তিক শ্রেণির মানুষের সংগ্রামী মানসচিত্রকেই পরিস্ফুট করেছেন। গ্রামের ধর্মের ষাঁড় মানিক, যে কিনা কখনো লড়াই করেনি, কিন্তু বিদেশি ষাঁড় অবলাকান্তের কাছে মার খেতে খেতে সে-ই হয়ে ওঠে দুর্দান্ত প্রতাপশালী এবং শেষাবধি অবলাকান্ত তার কাছে হার মানতে বাধ্য হয়। লেখকের ভাষায় :

> হঠাৎ, একেবারে আকস্মিকভাবে মানিক, সম্ভবত অত্যন্ত উপদ্রুত এবং বিরক্ত হয়ে পিছন ফিরেই অবলাকান্তের পাঁজরায় এমন সাংঘাতিক একটা গুঁতো দিল আর তেমনি করেই ওকে এমনভাবে ঠেলতে শুরু করল যে অবলার নেহাৎ চারটে পা ছিল – না হলে অত তাড়াতাড়ি পিছিয়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হতো না। মানিক তাকে ঠেলতে ঠেলতে পগারের দিকে-ঢালু জমিটার উপরের দিকে নিয়ে চলল। (হাসান, ২০০১ : ২১০)

গ্রামের ধর্মের ষাঁড়ের সঙ্গে বিদেশি ষাঁড়ের লড়াই গ্রামবাসীর মনে বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসে। তারা গ্রামের ধর্মের ষাঁড়ের হার-জিতের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়, এমনকি বিশ বছর ধরে বিছানায় পড়ে থাকা শ্বাসকষ্টের রোগী নিশানাথ পর্যন্ত আলোড়িত হয় এই ঘটনায়। গ্রামবাসীর মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনার সৃষ্টি হয় মানিককে ঘিরে। গল্পকারের ভাষায় :

> কি যে হয় কেউ বুঝতে পারে না। শান পাথরে ইস্পাত ঘষলে যেভাবে আগুন ছিটকে ছিটকে পড়ে সেইভাবে নিশানাথের বিছানার চারপাশের ভিড় থেকে উত্তেজনা নিষ্কাশিত হতে থাকে। আর গাঁজা ভাঙ মদের মতো উত্তেজনাও তো একটা নেশা! একটা অদ্ভুত আবেগ এসে তাদের চেপে ধরে। তাদের ষাঁড় মানিকের পক্ষে চলে যায় সবাই। গাঁয়ের ইজ্জতের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলে ব্যাপারটা। তাদের কথাবার্তা থেকেই বোঝা যায় মানিকের জন্যে তারা সমর্থন জড়ো করতে শুরু করেছে। এমনকি নিশানাথের মরণের ব্যাপারটাও পানসে পানসে ঠেকছে তাদের কাছে এরই মধ্যে। (হাসান, ২০০১ : ২১৫)

মানিকের সঙ্গে অবলার লড়াই পুরো গ্রামবাসীর মনে এক নতুন আশার সঞ্চার করে, এমনকি মৃত্যুপথযাত্রী নিশানাথ পর্যন্ত এই ঘটনায় আলোড়িত হয়। নিশানাথের শয্যার পাশে বসে যখন মানিক-অবলার লড়াই নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল, তখন স্ত্রী তাকে মালিশ করতে ভুলে গেলেও, তার নিঃশ্বাস সহজ হয়ে যাওয়ার ঘটনাটি ইঙ্গিতবহ।

> নিশানাথের বউ মালিশ করা ভুলে হাঁ করে এই সব কথা শুনছিল। আর আশ্চর্যের ব্যাপার মালিশ বন্ধ করতেই নিশানাথের নিশ্বাস সহজ হয়ে গেল। একটু টরটরেও হয়ে এলো যেন। বেশ সহজ হতেই চাইল নিশানাথ। নিশানাথের বউয়ের খাঁড়ার মতো নাক কেমন জেদি আর একরোখা হয়ে গেল। (হাসান, ২০০১ : ২১৫)

গ্রামবাসী নিশানাথ কবিরাজের সুস্থ হয়ে ওঠা আর মানিকের সঙ্গে বিদেশি ষাঁড় অবলার লড়াইয়ের বিষয়টিতে খুবই অবাক হয় কিন্তু তারা এ ঘটনা দুটিকে তখনো নিজেদের জীবনের সঙ্গে একাত্ম করতে পারে না।

> নিশানাথ কি অজেয় প্রাণশক্তির জোরে মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরে এলো তা ভেবে তাদের খুব অবাক লাগল। [...] অভিজ্ঞরা বলছে ভবলীলা সংবরণ করা ছাড়া তার উপায় ছিল না। কারণ, যে মানুষ খাবি খায় সে আর উঠে বসে রুটি খেতে পারে না। বলতেই হয় ইতিমধ্যে কিছু একটা নিশ্চয়ই ঘটে গেছে। এই সময় অনেক দূর থেকে মানিক বা অবলার চিৎকার শোনা গেল।

> গভীর, মোটা ও ঘষা একটা গর্জন। খুব পরিষ্কার শোনা গেল কারণ রাত বলে অন্যান্য শব্দ তো ছিল না। এত স্পষ্ট এলো আওয়াজটা যে কারও সন্দেহ হলো সেটা নিচে থেকে আসছে এবং এখুনি গভীর গর্জনে মাটি ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। (হাসান, ২০০১ : ২৩২)

এই দুটি ঘটনার সমান্তরালে আরেকটি ঘটনা এগিয়ে গেছে মুলত, এটিই লেখকের মূল অভীষ্ট। আর সেটি হলো – শহুরে ব্যবসায়ী কর্তৃক জোরপূর্বক কৃষকদের ধান কেটে নেয়া। শহুরে যে ব্যবসায়ীটি তাদের ধান কেটে নিতে চায় তাকে গ্রামের অনেকে দেখেইনি। তার সঙ্গে এদের প্রকাশ্য কোনো শত্রুতাও নেই। তার জীবনযাপন ও খাদ্যাভ্যাসের ধরনই আলাদা। শহুরে সেই ব্যবসায়ীটি আসলে শ্রেণিশত্রু। তার শারীরিক উপস্থিতি এই পুজিঁবাদী সমাজব্যবস্থায় দরকার হয় না। কারণ, সে নির্বিশেষ হয়েও বিশেষ একজন। অদৃশ্য এক নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে তারা শোষণের জাল বিস্তার করে চলেছে পুরো পৃথিবীজুড়ে। শিল্পভিত্তিক সমাজে তারা শ্রমিকের শ্রম চুরি করে পুঁজির পাহাড় গড়ে তোলে আর কৃষিভিত্তিক সমাজে কৃষকদের শ্রমে-ঘামে উৎপাদিত ফসল কেড়ে নিয়ে বিপুল পুঁজির মালিক হয়। দুই ক্ষেত্রে শোষণের ধরনটি আলাদা হলেও শোষকের চরিত্র মূলত একই। এ সম্পর্কে একজন সমালোচকের উক্তি প্রণিধানযোগ্য :

> মানুষের নিজের শ্রমের উপর আগের দিনে তার সম্পদ নির্ভর করত। উৎপাদকরা নিজেরাই দ্রব্য বিনিময় করে নিজের শ্রমশক্তি অনুযায়ী সম্পদ অর্জন করতে পারত। এখন উৎপাদিত দ্রব্যের উপর শ্রমিকের কোনো দাবী নেই'ই উপরন্তু বিনা পয়সায় তাকে খানিকটা শ্রম খরচ করে দিয়ে আসতে হয়, সেই উদ্বৃত্ত শ্রমের মূল্য লাভ করে পুঁজিপতি। সেই মূল্য খানিকটা পুঁজিপতির মুনাফার ঘরে জমা হয়ে আত্মপ্রয়োজনে খরচ হয়, খানিকটা পুঁজির ঘরে সঞ্চিত হয়ে স্ফীতকায় হতে থাকে। পুঁজিপতি মূর্ত্তিমান পুঁজি – তাছাড়া তার আর কোনো ঐতিহাসিক ভূমিকা নেই। কৃপণের মত সঞ্চয়ের খাতিরেই সঞ্চয় করার লোভ তার, সম্পদকে সম্পদ-সংগ্রাহক করে তুলতে পারলেই সে সুখী। (সঞ্জয়, ২০১১ : ৬৪)

বক্ষ্যমাণ গল্পেও আমরা দেখি শহুরে ব্যবসায়ীটিকে গ্রামের মানুষ দেখেনি কিন্তু সে এক মিথ্যা অজুহাতে ফসল কেটে নিতে চায় মাঠ থেকে। লোনা পানি থেকে বিল বাঁচানোর জন্যে শহুরে সেই ব্যবসায়ী নাকি জলবিদ্যুৎ বিভাগের কাছ থেকে চুক্তি নিয়েছিল। এই চুক্তি অনুযায়ী আগামী চার বছর পর্যন্ত ফসলের দু'আনা অংশ নাকি তার প্রাপ্য। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হলো – দীর্ঘদিন ধরে গ্রামের কৃষকরা জলবিদ্যুৎ বিভাগে আবেদন-নিবেদন করেও বাঁধ তৈরি করাতে না পেরে শেষপর্যন্ত কৃষকরাই বাঁধটি তৈরি করেছিল। তাই শহুরে ব্যবসায়ী কর্তৃক মাঠের ধান কেটে নেবার ঘটনাটি প্রথমে তাদের কাছে বিস্ময়কর ঠেকেছিল। কিন্তু কীভাবে এর প্রতিকার করতে হয় সে সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা ছিল না। লেখকের বর্ণনায় :

> শেষে এমন তালগোল পাকিয়ে গেল যে কীভাবে এই অত্যাচারের প্রতিকার হতে পারে সে সম্বন্ধে কেউ কিছু বলতে পারে না। কেউ কেউ ঠ্যাঙানি দেবার পক্ষে ছিল। ঝামেলা এড়িয়ে কোনোরকমে ধান কেটে ঘরে তোলার পক্ষে ছিল কিছু লোক। মোট কথা ঘোঁট পাকিয়ে গেল সমস্ত ব্যাপারটা। কারো কারো এমন রাগ হলো যে ব্যবসায়ীটিকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে ফেলার কথা বলতে লাগল। (হাসান, ২০০১ : ২২১)

গ্রামের মানুষ বুঝে উঠতে পারে না কীভাবে শহুরে ব্যবসায়ীটির হাত থেকে মাঠের ফসল রক্ষা করা যায়। নানাজন নানারকম কথা বলে ব্যাপারটিকে চূড়ান্ত অনিশ্চয়তার দিকে নিয়ে যায়। তারপর

জনৈক কৃষকনেতা চাষিদের তাদের দাবি সম্পর্কে সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ করে তোলেন। কৃষকনেতা তার সম্মোহনী বক্তৃতার মধ্য দিয়ে চাষিদের মধ্যে নবপ্রাণের সঞ্চার করার প্রয়াস পান। কিন্তু যুগ যুগ ধরে যারা কেবল শোষিতই হয়ে আসছে তাদেরকে প্রতিরোধ-সংগ্রামের পথে নিয়ে আসা খুব সহজ কাজ নয়। শোষণ-বঞ্চনা তাদের রক্তে মিশে গেছে। তাই কীভাবে গর্জে উঠতে হয়, সেই বোধটিও যেন লোপ পেয়েছে তাদের। এদের এই আচরণে কৃষকনেতাও একপর্যায়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। লেখকের বর্ণনায় : "পুরুষানুক্রমে শোষিত হতে হতেও যারা ভবিতব্য এবং অদৃষ্টের কাছে আত্মসমর্পণ করে বা ঈশ্বরের কাছে বিচার চায়, তাতে যার যা সুবিধাই হোক কৃষককর্মী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে বিচিত্র কি" (হাসান, ২০০১ : ২২২)। গ্রামের মানুষগুলো বেঁচে থাকার জন্য প্রতি মুহূর্তে সংগ্রাম করে চলেছে। অথচ তারা শ্রেণিশত্রুকে চিহ্নিত করে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারছে না। ধর্মীয় অন্ধতা, গোঁড়ামি আর শোষণ-বঞ্চনা এদের জীবনকে করে তুলেছে দুর্বিষহ। তাই এই অসংগঠিত শক্তিকে প্রতিরোধের মন্ত্রে দীক্ষিত করতেই কৃষকনেতার আত্মপ্রকাশ। কৃষকনেতা গ্রামবাসীকে বোঝানোর চেষ্টা করেন এবং বলেন : এবার যদি চরিত্রভ্রষ্ট, নীতিহীন শহুরে ব্যবসায়ী ধান কেটে নিয়ে যেতে সফল হয়, তাহলে আগামী বছরের পথটিও তার জন্য সহজতর হবে, তখন গ্রামের মানুষদের অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে! রাষ্ট্রীয় প্রশাসন যন্ত্রও যে শহুরে ব্যবসায়ীর অনুকূলে কাজ করবে, তাও তিনি তাদের বোঝানোর প্রয়াস পান। ব্যাপারটা মোটেই যে সহজ নয়, এবং সম্মিলিত প্রতিরোধ ছাড়া মাঠের ধান রক্ষা করা যে দুঃসাধ্য তাও তিনি তাদের বুঝিয়ে বলেন। শেষতক কৃষকনেতা এইসব অন্ধবিশ্বাসী, অসংগঠিত মানুষদের সম্মিলিত প্রতিরোধে দীক্ষিত করতে সক্ষম হন। ফলে পুরুষানুক্রমে নিপীড়িত, নিগৃহীত, শোষিত, বঞ্চিত মানুষেরা অধিকার রক্ষার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে সম্মিলিতভাবে। গল্পকারের বর্ণনায় বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে এভাবে :

> মাত্র ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যেই একটিমাত্র কর্মসূত্রে বাঁধা পড়ে গেল প্রায় সকলেই, জড়িয়ে পড়ল বলা যেতে পারে। [...] এইভাবে প্রায় সকলেরই কিছু করণীয় থেকে গেল। এক পর্যায়ে এসে ব্যাপারটা এমন দাঁড়ালো যে, কাজটাই তাদের মন জুড়ে রইল, কি কারণে এই কাজে তারা নেমেছে তা আর মনেও থাকল না তাদের। নিজের নিজের কাস্তে পরীক্ষা করে নিল তারা। সড়কি এবং বল্লমগুলোয় মর্চে ধরে গেছে, দু-একটি বাতিলও হয়ে গেছে, ঢালগুলির বাঁশের ছাউনিতে ঘুন ধরেছে হয়তো। [...] মোটকথা যে সময়ে গাঁয়ের মানুষ খেয়েদেয়ে কুপি নিভিয়ে দিয়ে নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে যায় – নির্বিবাদে মড়ার মতো পড়ে থাকে – এমনকি মহাবিপদেও যাদের জাগিয়ে তোলা কঠিন – ঠিক সেই সময়েই সমস্ত গ্রামটি উত্তেজনার অগ্নিকাণ্ডে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। (হাসান, ২০০১ : ২৩০-৩১)

এভাবেই হাসান আজিজুল হক অসংগঠিত গ্রামবাসীর মনে সম্মিলিত প্রতিরোধের বীজ রোপণ করেন। তাদের ভেতরে সুপ্ত সংগ্রামী মনোভাবকে ফুটিয়ে তোলেন অনবদ্য ভাষাব্যঞ্জনায় :

> মোটকথা ক্ষুধা ও দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রামটা হয়তো চোখে দেখতে পাওয়া যায় না সব সময়ে – কিন্তু চলছে তো প্রতি মুহূর্তেই। কখনো তীব্র হয়ে ওঠে, কখনো বা নিশানাথের সংসারের মতো ধিকিয়ে ধিকিয়ে চলে। এইদিক থেকে দেখলে ঘানি চালিয়ে যে তেল সংগ্রহ করছে, যে হাঁড়ি বানিয়ে যাচ্ছে একটার পর একটা, এমনকি যে বাড়িতে শিশুরা খিদে হজম করছে নির্বিকার মুখে – তাদের সকলের মধ্যেই তো লড়াইটা এলিয়ে ছড়িয়ে আছে। (হাসান, ২০০১ : ২২৪)

শেষাবধি দেখা যায়, বৈষম্য ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে গ্রামবাসীদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামী চেতনার

স্ফুরণ হয়। তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়। প্রতিবাদে সরব হয়ে ওঠে সমস্ত গ্রামবাসী।

হাসান আজিজুল হক সাম্যবাদী জীবনাদর্শে আস্থাবান কথাশিল্পী। 'জীবন ঘষে আগুন' গল্পে তিনি শোষণ-বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। বঞ্চনার শৃঙ্খল ভেঙে একটি সুষম, সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠাই এ গল্পের মৌল অন্বিষ্ট। হাসান আজিজুল হক এই গল্পে রাঢ়বঙ্গের কৃষকদের শ্রেণিশোষণের নির্মম চিত্র যেমন অঙ্কন করেছেন, তেমনি শোষিত-বঞ্চিত মানুষের শ্রেণিচেতনায় জেগে ওঠার দুরন্ত সাহসিকতার চিত্রও প্রদর্শন করেছেন। গল্পে নিরন্ন ভূমিহীন তেঁতুলে বাগদীরা ধর্মতন্ত্র ও শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে থাকে। সমাজের ভেতরে ক্রিয়াশীল শ্রেণিদ্বন্দ্বটি তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর যারা এইসব ক্ষুধার্ত অসহায় মানুষকে এতদিন ধর্মের আফিম খাইয়ে শোষণ করে এসেছে তাদের মনেও ভয় ধরে গেছে; কারণ, যেকোনো সময় এইসব নিরন্ন মানুষ তাদের আক্রমণ করতে পারে। পুরোহিতের কথায়ও তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দেবদেবীর শক্তিতেও তিনি সন্দিহান হয়ে ওঠেন :

> শিখাধারী পুরোহিত নিদারুণ ভীত – বক্তৃতার উদ্যোগ মাত্রেই বুক দুরু দুরু কাঁপে – যদিবা এখানে একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়, যদিবা তেঁতুলে বাগদীর দল লম্ফে ওঠে দাঁড়ায় আর তাদের শূন্য উদর ঢকঢক বাজে। তখন? তখন কে রক্ষা করবে তাকে? মা কি এতই জাগ্রতা! অধুনা দেবদেবী যে বড়ই বিস্তৃতিপরায়ণ, সুষুপ্তিমগ্ন, অথর্ব। (হাসান, ২০০১ : ২৫৫)

ভূমিহীন তেঁতুলে বাগদীদের যন্ত্রণাকাতর জীবনবাস্তবতা তাদেরকে প্রতিবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে যেমন ধর্মতন্ত্রের বিরুদ্ধে, তেমনি শোষকদের বিরুদ্ধে। একদিকে রুক্ষ প্রকৃতি, অন্যদিকে বাবুদের শোষণ-বঞ্চনা তাদের জীবনকে করে তোলে দুর্বিষহ। এই অসহনীয় জীবনযন্ত্রণাই তাদেরকে শ্রেণিসংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে। তাই পুরোহিত যখন মা অন্নপূর্ণার অলৌকিক শক্তির কথা প্রচার করেন এবং হলকর্ষণের আদেশ দেন, তখন তেঁতুলে বাগদীদের মধ্যে দেবীর প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের বিপরীতে ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা যায় :

> ই মাটি কার? ই কি মোদের? বলো গঁ – লিব্বাক হবে না খবরদার। কোন মাঠে যাবো মোরা? মুখে গামছা জড়ানো দল মনে মনে ভাবে, এই মাটি তুমাদের। আমাদেরও বটে। তবে উয়ার ভ্যাতরে যাবার লেগে। কবর-লাগ হবার লেগে। ভাবনাতেই তাণ্ডব, নৃত্য আর সংগীত শুরু হয়ে যায়। রই রই চিৎকারধ্বনি, কথা বলো ঠাকুর মোশাই, আমাদের বাপের গুরু তুমার বৌ কি ন্যাংটা হঁয়েছে কখুনো – ক্ষিদেতে মাটি খেঁয়েছে হে – বেতের কালে প্যাট বাজালছে ঢোলের মতুন ববম্ ববম্? বলো, ই মাটি তুমার বাপের কিনা? (হাসান, ২০০১ : ২৫৬)

অবশেষে একটি রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে হলকর্ষণের আয়োজন সমাপ্ত হয়। কিন্তু এর মধ্যে আরেকটি ঘটনা ঘটে, যার মধ্য দিয়ে বাবুশ্রেণির প্রতি তেঁতুলে বাগদীদের ক্ষোভ ও প্রতিবাদ চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়। হলকর্ষণের রাতে অন্যান্য বাবুদের থেকে দলছুট হয়ে ঘণ্টাবাবু আসে কালীকে ভোগ করার জন্য। অভাব, দারিদ্র্য, ক্ষুধা আর স্বামীর পঙ্গুত্বের কারণেই অর্থের বিনিময়ে কালী ঘণ্টাবাবুর ভোগের সামগ্রী হতে বাধ্য হয়। অভাবের কাছে সে তার সম্ভ্রম বিক্রি করতে সম্মত হয়। কালীও হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে, বাগদীদেরকে সবদিক থেকেই শোষিত, বঞ্চিত করা হয়, নিচু জাত বলে বাবুরা তাদের অবজ্ঞা করে, কিন্তু বাগদীদের মেয়েদের শরীর নিয়ে তাদের কোনো আপত্তি নেই। কালীর কথায়, বাবুশ্রেণির প্রতি তেঁতুলে বাগদীদের ক্ষোভ ও প্রতিবাদ এবং বাবুদের

ভদ্রতার মুখোশের অন্তরালে লুকিয়ে থাকা পাশবিকতার স্বরূপটি উন্মোচিত হয় :

> ছোটলোকের হাতে জল খেঁলে জাত যাবে যি গঁ তুমার। বুলছো কি – আঁ? [...] তাইলে ছোটজাত মানুষ বটে বুলছো – আরি বাবারে বাবা। ছোটজাতের জলে দোষ নাই বটে, বাহারি বাহ! ছোটজাতের আর কিসে দোষ থাকতে নাই বল দিকিনি বাবু? [...] ছোট জেতের সবেতেই দোষ। তবে একটোতে বোধায় দোষ নাই – কি বলো বাবু ? [...] ছোটজেতের মিয়েতে দোষ নাই। ঠিক কথা লয়, বাবু। মিয়েগুনো খায় না দায় না, তবু তাদের গতর হয় ধাড়ি শুয়োরের মতো, লয়? ভারি মজার কথা বটে! (হাসান, ২০০১ : ২৬৯-৭০)

গল্পকার ভূমিহীন শোষিত তেঁতুলে বাগদীদের যন্ত্রণাকাতর জীবনের বঞ্চনা ও অসহায়ত্বের চিত্র উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে শ্রেণিশোষণের নির্মম বাস্তবতা তুলে ধরেছেন। তেঁতুলে বাগদীরাও তাদের শ্রেণিশত্রুকে চিহ্নিত করতে পেরেছে বলেই সকলের সম্মিলিত প্রতিরোধে ঘণ্টাবাবু প্রাণ হারায়। ঘণ্টাবাবুকে হত্যার মধ্য দিয়ে তারা বাবুশ্রেণির হাত থেকে নিষ্কৃতি চায়; শোষণের হাত থেকে পরিত্রাণ চায়। ঘণ্টাবাবুকে হত্যার মধ্য দিয়ে তেঁতুলে বাগদীদের মধ্যেকার শ্রেণিচেতনা ও শ্রেণিসংগ্রামের বিষয়টি আরো সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। শ্রেণিশত্রুকে তারা যে কেবল চিহ্নিত করে তাই নয়, শ্রেণিশত্রুকে তারা নিশ্চিহ্ন করতেও বদ্ধপরিকর। কয়েকটি উদাহরণের মধ্য দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে :

> ক. মানুষেরা পুনঃ পুনঃ আঘাতের শ্রমে শ্রান্ত, এলিয়ে-পড়া সমস্ত অন্ধকারের দিকে চেয়ে তখনও নিঃশব্দ কোলাহলে কেঁপে কেঁপে উঠল, কেউ কেউ পেট চেপে মূর্ছা গেল, কেউ লেজ কামড়ানো পাগলা কুকুরের মতো আপন বাহু দংশন করছিল। এসবেতেই চরম বিশৃঙ্খলা – সেজন্যে কাউকে বলতে হয়, আর লয়, শ্যাষ হঁয়ে গেলচে – এই বলে প্রচণ্ড লাথি কষে আবার বলে, সবই আক্রা গঁ – শুধু মেয়ে মানুষ শস্তা, লয়? শালো কুকুরের জন্মিত শুয়োর, মজাটো বোঝ কেনে এখন। (হাসান, ২০০১ : ২৭৪)
>
> খ. পাড়ার সবাই মিলে উক্ত শুকরজাত বাবুটিকে নিকেশ করে দিয়েছে এবং ভবিষ্যতে এরূপ আরও আরও ভদ্দরনোক নিশ্চিতই নিধন হবে। (হাসান, ২০০১ : ২৭৭)
>
> গ. খুনটো আমরাই করেছি – এই কথা মনোহর ভেবেচিন্তে বলে। আপন জাতভাইদের মুখের দিকে একবার চোখ দুটি বুলিয়ে, সে আবার বলে, বড়ো জ্বালায় জ্বলছি মোরা, [...] মোদের পেটের মধ্যে জ্বালা, ঢ্যামনা বাবুরা মোদের উপোষী মেয়েমানুষ চাঁটে – খিদেয় মানুষ ফাঁসি যায়, লিজেরা লিজেরা লটকায় গাছের ডালে, সোনার পুত শুকিয়ে মরে বটে! (হাসান, ২০ ০১ : ২৯০)
>
> ঘ. বাবুরা মোদের পাড়ায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছে গঁ – ভাইরা শোনো, শোনো – এই কথায় গান কই? উল্টে মনোহরের পায়ের ক্ষতে সিংহের হৃদয় এসে ঠাঁই নেয়। কর্তিত মহিষ ঘটনাস্থলেই পড়ে থাকে, মানুষ নেই, দেবীমূর্তি মুহুর্মুহু লাঞ্ছিত, আগুনের বাতাসে জাদুগৃহের কালো পর্দাগুলি পৎপৎ, সার্কাসের ঘোড়াটি শূন্যে অবাস্তব দৌড় লাগায়, ইতিমধ্যে কোনো কোনো মানুষের চোখের পলকটিই দেখা যায়, আয়, শালোরা, দাদ লি, আয় ভাই জুলুমের লিকেশ দেখি – এই ধ্বনি অতি সূক্ষ্ম তরবারিবৎ সোঁৎ করে মেলার এই প্রান্ত থেকে ঐ প্রান্ত ফুঁড়ে দেয়। মস্তাজ গামছাটি মুখ থেকে খুলে কোমরে বাঁধে। (হাসান, ২০০১ : ২৯২)

উপরের উদ্ধৃতি চতুষ্টয়ে বাবুশ্রেণির সঙ্গে ভূমিহীন তেঁতুলে বাগদীদের শ্রেণিচেতনা ও শ্রেণিসংগ্রামের স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে। প্রথম উদ্ধৃতিতে আছে বাবু শ্রেণির প্রতি ক্ষুব্ধ তেঁতুলে

বাগদীদের দ্বারা ঘণ্টা বাবুর নির্মমভাবে নিহত হবার কথা। 'খ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে আছে ভবিষ্যৎ শত্রুদেরকে নিধন করার সম্মিলিত প্রত্যয়। তারা শ্রেণিশত্রুকে আর ছেড়ে কথা বলবে না, সে যেই হোক। 'গ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে আছে তেঁতুলে বাগদীদের যন্ত্রণার কথা, বঞ্চনার কথা, হাহাকার ও সম্ভ্রমবোধের কথা, এবং বাবুশ্রেণির প্রতি তাদের তীব্র ক্ষোভের কথা। 'ঘ' সংখ্যক উদ্ধৃতিটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ ঘণ্টাবাবুকে হত্যার কারণে তেঁতুলে বাগদীদের ওপর নেমে আসে দুর্বিষহ নিপীড়ন। বাবুশ্রেণি তেঁতুলে বাগদীদের পাড়ায় আগুন ধরিয়ে দেয়। ফলে তাদের সামনে বেঁচে থাকার একটা পথই খোলা থাকে, আর সেটা হলো সংগ্রাম – আর এ সংগ্রাম হলো তেঁতুলে বাগদীদের অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রাম। বাবুশ্রেণির সঙ্গে আপাত-প্রীতির সম্পর্ক তৈরি করেও উভয়ের মধ্যকার দূরত্ব হয়তো ঘোচানো যেত। কিন্তু :

> শোষক শ্রেণির সঙ্গে শোষিত শ্রেণির যে-বিশাল দূরত্ব তা উভয়ের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে দূরীভূত হতে পারে না। এই বৈষম্য দূর করবার একমাত্র উপায় হল শোষণকারী শ্রেণিকে আঘাত করে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা। (মহীবুল, ২০১১ : ৭৮)

তাই ঘণ্টাবাবুকে হত্যার কারণে যে মন্তাজ মনোহরকে বলেছিল : "আঃ মনা, মানুষ না মেরে মানুষ বাঁচে লিকিন? মানুষ কুকুর হলছে – সি মানুষ মারলে কুকুর মরে" (হাসান, ২০০১ : ২৯০)। বাগদী পাড়ায় আগুন ধরিয়ে দেবার পর সেই মন্তাজই শ্রেণিশত্রু তথা বাবুশ্রেণির বিরুদ্ধে বেপরোয়া হয়ে ওঠে। শ্রেণিশত্রুর বিরুদ্ধে মন্তাজ মনোহরসহ সাধারণ তেঁতুলে বাগদীরা সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তোলে। শ্রেণিশত্রু বিনাশে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়। মন্তাজ তার গামছাটি মুখ থেকে খুলে কোমরে বেঁধে নেয়। অর্থাৎ বাবুশ্রেণির বিরুদ্ধে তেঁতুলে বাগদীদের বিদ্রোহের সূত্রপাতের মধ্য দিয়ে গল্পটি শেষ হয়। গল্পের শুরুতে আমরা যে রাজহস্তীকে উৎপীড়কের প্রতীক হিসেবে দেখেছি, গল্পের শেষে এসে দেখি সেই রাজহস্তীই তেঁতুলে বাগদীদের বিদ্রোহের প্রতীক হিসেবে বৃংহিত রবে অত্যাসন্ন যুদ্ধের সঙ্গীত রচনা করছে।

'মাটি-পাষাণের বৃত্তান্ত' গল্পে হাসান আজিজুল হক শোষক ও জোতদারের বিরুদ্ধে ভূমিহীন একামতউল্লার প্রতিবাদী চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। সরকার ভূমিহীন অসহায় মানুষকে খাস জমির মালিকানা লিখে দিতে চেয়েও শেষ পর্যন্ত নানা রকম অজুহাতে এই বরাদ্দ প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেয়। কিন্তু এই বাহানার পরেও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিক মোনাজাতউদ্দিন জানতে পারেন একামতউল্লাহ নামক একজন ভূমিহীনের জমি বরাদ্দ পাবার কথা। সাংবাদিক মোনাজাতউদ্দিন তখন বিষয়টির সত্যতা যাচাই করার জন্য সরেজমিন তদন্ত করেন এবং স্থানীয় একজন চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলেন; জোতদারের সঙ্গে দেখা করেন। জোতদারকে দেখেই সাংবাদিক মোনাজাতউদ্দিন বুঝতে পারেন অন্যের জমি হজম করার মতো শক্তি ও ক্ষমতা তার আছে। সাংবাদিক মোনাজাতউদ্দিন জোতদারের শারীরিক অবয়বের মধ্যেই শ্রেণিশোষকের রূপটি প্রত্যক্ষ করেন :

> লোকটা যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো তখন তার ভুঁড়ির সাইজ দেখে মোনাজাতউদ্দিন নিশ্চিত হতে পারেন যে বহু খালবিল জমাজমি পেটের মধ্যে তাঙরানোর ক্ষমতা তার আছে, সে অজগরের মতো আমুণ্ড গোটাগুটি খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত। (হাসান, ২০১১ : ১৩৪)

তারপর মোনাজাতউদ্দিন জমির প্রকৃত মালিকানা সম্পর্কে নিশ্চিত হবার পর অশিক্ষিত ও

অসচেতন একামতউল্লার কাছে জমির মালিকানা সম্পর্কে জানতে চান, তখন সে জোতদারকেই জমির মালিক হিসেবে জাহির করে। একামতউল্লার অশিক্ষা ও অসচেতনতার এই সুযোগ জোতদার পুরোপুরি ব্যবহার করে। কিন্তু সাংবাদিক মোনাজাতউদ্দিন যখন একামতউল্লার "মাথাটা টেনে নিজের মুখের কাছে এনে তকবির দেওয়ার মতো তার কানের ভিতরে ঝড়ের বাতাসের আওয়াজ আর মাটি ডালভাতের মতো প্রিয় রংপুরের ভাষায় মেশানো একটা অদ্ভুত অবিশ্বাস্য মন্ত্র শুনিয়ে যায় : "জমিনটা আপনের, আপনে জানেন না বাহে, এই জমিন আপনে পাইছেন, জোতদার আপনেরে কয় নাই। কোনো দিন কহিবে না, আপনে ভাতুয়া থাকি যাইবেন। জমিন আপনের দখলে নিয়া ন্যান বাহে" (হাসান, ২০১১ : ১৩৬)। তখন মোনাজাতউদ্দিনের বলে যাওয়া তিন বিঘা জমি শোষক জোতদারের দখল থেকে মুক্ত করার জন্য একামতউল্লা বার বার আবেদন জানায়। জোতদার নানা টালবাহানায় জমির মালিকানা বুঝিয়ে দিতে বিলম্ব করে। এমনকি একামতউল্লার মহিষ না থাকার অজুহাত দেখিয়ে জমিটা কুক্ষিগত করে রাখতে চায় জোতদার। কিন্তু একামতউল্লাও হাল ছাড়ে না; সে এখন অধিকার সচেতন এবং ন্যায্য অধিকার বুঝে নিতে বদ্ধপরিকর। তাই এতদিন ধরে জোতদারের বাড়িতে আশ্রিত একামতউল্লার সাহসী উচ্চারণ : "মালিক, তিন বিঘা গমের জমির হামি মালিক। সরকার হামাকে লিখে দেছে। [...] জমিটা হামসারে দ্যান মালিক। আপনের তো অভাব নেই। অত খাইবেন না, প্যাটত জায়গা হইবে না।" (হাসান, ২০১১ : ১৩৬)

গল্পের শুরুতে যে একামতউল্লাকে দেখা যায়, নিজের অধিকার সম্পর্কে অসচেতন, মোনাজাতউদ্দিনের কাছ থেকে চেনাভাষায় মন্ত্র পেয়ে সেই হয়ে ওঠে অধিকার-সচেতন এবং প্রতিবাদী। গল্পকার দেখাতে চেয়েছেন গ্রামের এইসব অসহায় মানুষের অশিক্ষা, অসচেতনতার সুযোগ নিয়ে জোতদাররা যুগের পর যুগ ধরে শোষণ প্রক্রিয়া চালু রেখেছে। তাই এইসব অশিক্ষিত এবং অসচেতন শোষিত মানুষকে শ্রেণিসংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে প্রয়োজন হয় মোনাজাতউদ্দিনের মতো শিক্ষিত, সচেতন মানুষের। যাদের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে একামত, তাকিবুল, নছর, কিরুর মতো নিরীহ মানুষেরা ঐক্যবদ্ধ হয় শোষকের বিরুদ্ধে এবং ন্যায্য হিস্যা বুঝে নিতে হয়ে ওঠে প্রতিবাদমুখর। এইসব শোষিত, বঞ্চিত মানুষের ঐক্যবদ্ধ শক্তির কাছে শোষকদের পতন হয়ে ওঠে অবশ্যম্ভাবী। তাই গল্পের শেষদিকে শোষকরূপী জোতদারের দশদিন ধরে মলত্যাগ করতে না পারার ব্যর্থতা এবং পরিণামে তার মৃত্যুবরণ – সম্মিলিত প্রতিরোধের ফাঁদে শ্রেণিশোষকের পরাজয়ের প্রতীকী অর্থই বহন করে :

> দশ দিনের মাথায় নিজের পঞ্চাশ একর জমির ঠিক মাঝখানে বস্ত্রহীন উদোম জোতদারটি দু হাত মাটিতে পেতে প্রকাণ্ড এক হাতির মতো হাঁটু দুমড়ে আবার যেমন বসতে গেছে, তখুনি দেখেছে একামত, তাকিবুল, নছর, ফিরু, এই রকম নিরীহ নির্বিকার গায়ের মানুষদের, যারা কোনো কথা বলেনি, এতটুকু জুলুম করেনি, শুধু নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকেছে শেষ রাতের চাঁদের আলোয়। (হাসান, ২০১১ : ১৩৯)

এভাবেই সংঘশক্তির হাতে শোষকদের পরাজয় এবং অধিকারবঞ্চিত শোষিত মানুষের জয়ের বিষয়টি শিল্পায়িত হয়েছে এ-গল্পে। হাসান আজিজুল হক এই গল্পের মধ্য দিয়ে শোষিত বঞ্চিত মানুষের ভেতরকার সংগ্রামীচেতনাকে পরিস্ফুট করে তুলেছেন।

হাসান আজিজুল হকের 'কৃষ্ণপক্ষের দিন' গল্পে পাক হানাদার বাহিনীর দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার পাঁচজন তরুণের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাত থেকে দেশ ও দেশের মানুষকে উদ্ধারের জন্য স্কুলছাত্র একরাম, কলেজছাত্র শহীদ, খেতমজুর মতিয়ুর এবং চাষী রহমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জামিলের নেতৃত্বে দৃপ্ত প্রত্যয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অত্যাধুনিক সমরাস্ত্রসজ্জিত একটি দেশের প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রামের কোনোরকম পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াই তারা যুদ্ধে অংশ নেয়। দলপতি জামিলের কথায় ফুটে ওঠে কায়েমি স্বার্থান্বেষী মহলের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভ, ঘৃণা এবং নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন-বাসনা। তারা পাকিস্তানি শোষকদের পরাস্ত করে বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তারা ক্ষমতার হাতবদল চায় না, সকল মানুষের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত রাষ্ট্র চায়। এ গল্পের প্রধান চরিত্র জামিলের মধ্য দিয়ে লেখকের মানসভাবনারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে :

> কাউকে এদেশের বুকের উপর বসিয়ে দেবার জন্যে আমরা লড়ছি না। আমরা মালিক বদলাতে চাই না। প্রথমে ধরো এই বীভৎস গণহত্যা আর লুঠতরাজ। আমরা এই শুয়ারের বাচ্চাদের দেখাবো – ওদের দাঁত ভেঙে দেব। তারপর এই দেশ এই দেশের সমস্ত মানুষের হাতে যাবে। বুঝতে পারছ? (হাসান, ২০১৬ : ২৭১-২৭২)

'ফেরা' গল্পে হাসান আজিজুল হক দেখিয়েছেন শ্রেণিচেতনায় উদ্বুদ্ধ জনগণ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াইয়ের মাধ্যমে বাইরের শ্রেণিশত্রুকে হটাতে পারলেও দেশের ভেতরেই জন্ম নিয়েছে নতুন শ্রেণিশত্রু। যাদের ত্যাগের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, স্বাধীনতার সুফল তারা পায়নি। একটি সুবিধাভোগী শ্রেণির পতনের পর আরেকটি সুবিধাভোগী শ্রেণির উত্থানের ফলে সাধারণ মানুষের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি, তাদের জীবন হয়েছে আরো বিপর্যস্ত। নতুন জীবনের স্বপ্ন বুকে নিয়ে যারা যুদ্ধে গিয়েছিল দেশ স্বাধীন হবার পর তাদের সেই স্বপ্নের উচ্ছ্বাস ফিকে হয়ে যায়। দেশের ভেতরে জন্ম নেয়া সুবিধাভোগী শ্রেণির প্রতি তাদের ক্ষোভ বাড়তে থাকে এবং আরেকটি সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। তাই মুক্তিযোদ্ধা আলেফ যুদ্ধে ব্যবহৃত রাইফেলটা জমা না দিয়ে সযত্নে রেখে দেয় নতুন শ্রেণিশত্রুকে খতম করার মানসে : "বাড়ির দিকে ফিরে আসতে আসতে আলেফ ভাবে, ডোবাটা ছোট - রাইফেলটা খুঁজে পেতে তেমন কষ্ট হবে না" (হাসান, ২০১৬ : ২৯৮)। স্বাধীনতার সমস্ত সুযোগ - সুবিধা থেকে সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হয়েছে তো বটেই, দেশ স্বাধীন হবার পর দেশীয় শ্রেণিশত্রুদের হাতে সর্বস্ব হারিয়েছে অনেকে। 'ঘরগেরস্থি' গল্পে দেখা যায়, যুদ্ধ শুরু হবার পূর্বে রামশরণের বাস্তুভিটা ছিল – দীর্ঘ নয়মাস উদ্বাস্তু জীবনযাপনের পর দেশে ফিরে সেই ঠাঁইটুকুও হারিয়েছে সে। গল্পকার স্বাধীনতার পর দেশে ফিরে ভিটা হারানো রামচরণের স্বপ্নভঙ্গের বেদনা, বিপন্ন বাস্তবতার চিত্র যেমন উপস্থাপন করেছেন; তেমনি স্বাধীন দেশের নতুন শাসকগোষ্ঠীর মুখোশ এবং মুক্তিযুদ্ধের শ্রেণিচরিত্রটিকেও তুলে ধরেছেন অসাধারণ ভাষা ব্যঞ্জনায় :

> [...] স্বাধীন হইছি তাতে আমার বাপের কি? আমি তো এই দেহি, গত বছর পরাণের ভয়ে পালালাম ইন্ডেয় – নটা মাস শ্যাল কুকুরের মতো কাটিয়ে ফিরে আলাম স্বাধীন দ্যাশে। আবার সেই শ্যাল কুকুরের ব্যাপার। [...] স্বাধীনটা কি, আঁ? আমি খাতি পালাম না – ছোওয়াল মিয়ে শুকিয়ে মরে, স্বাধীনটা কোঁয়ানে? (হাসান, ২০১৬ : ৩০৮-৩০৯)

হাসান আজিজুল হক কেবল নিপীড়িত মানুষের দারিদ্র্য ও বঞ্চনার ছবিই আঁকেননি বরং অব্যর্থভাবে নির্দেশ করেছেন ওই দারিদ্র্য, বঞ্চনা ও শোষণের প্রকৃত স্বরূপসত্য। তিনি অশিক্ষিত-অসচেতন ভূমিহীন অন্ত্যজ জনসাধারণের ওপর উচ্চবর্গের শোষণের তথ্যচিত্র যেমন চিত্রিত করেছেন, তেমনি এই শোষণ-বৈষম্যের কারণ যে শ্রেণিশোষক, তাদের বিরুদ্ধে তিনি শোষিত ও নিপীড়িত জনগোষ্ঠীকে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছেন। কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) যেমন উপলব্ধি করেছিলেন :

> মানুষ নিজেকে সামাজিক জীব নয়, মানুষের সমাজই মানুষকে ব্যক্তিসত্তা-সমন্বিত করে। অর্থাৎ কেবলমাত্র সামাজিক জীব হওয়াই মানুষের পক্ষে যথেষ্ট নয়, রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের মাধ্যমে তাকে পূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হবে। (রংগলাল, ২০০৪ : ৩০৮)

হাসান আজিজুল হকের গল্পের প্রতিবাদী চরিত্রগুলো শুরুতেই প্রতিবাদী হয়ে ওঠে না, তাদেরকে তিনি শ্রেণিচেতনায় উদ্বুদ্ধ করেন, যাতে তারা সংঘশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে বৈষম্য ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। প্রতিবাদক্ষুব্ধ মানুষেরা তখন শ্রেণিশত্রুকে বিনাশ করার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। হাসান আজিজুল হক চান, রাজনৈতিকভাবে অসচেতন এসব মানুষ তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হোক এবং ন্যায্য হিস্যা বুঝে নিক। এভাবে হাসান আজিজুল হক তাঁর গল্পে শোষক ও শোষিতের আবহমান দ্বন্দ্বকে উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে অশিক্ষিত অসচেতন মানুষকে শ্রেণিসচেতনতা ও শ্রেণিসংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেন। ফলে তাঁর গল্পগুলো হয়ে ওঠে শ্রেণিচেতনা ও শ্রেণিসংগ্রামের অনবদ্য কথামালা।

সহায়কপঞ্জি

আবু জাফর (১৯৯৬)। *হাসান আজিজুল হকের গল্পের সমাজবাস্তবতা*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

চন্দন আনোয়ার (২০১৯)। *হাসান আজিজুল হকের কথাসাহিত্য : বিষয়বিন্যাস ও নির্মাণকৌশল*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০০৯)। *বাংলাদেশের সাহিত্য*। আজকাল, ঢাকা।

মহীবুল আজিজ (২০১৮)। *হাসান আজিজুল হক : রাঢ়বঙ্গের উত্তরাধিকার*। লিটল ম্যাগাজিন, চট্টগ্রাম।

মোহা. হাফিজুর রহমান (২০২১)। *বিভাগোত্তর বাংলাদেশের উপন্যাস : মার্কসীয় ধারা (১৯৪৭-২০০০)*। বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা।

রংগলাল সেন (২০০৪)। *সমাজকাঠামো : পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র।* নিউ এজ পাবলিকশন্স, ঢাকা।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য (২০১১)। *কার্ল মার্ক্স : জীবন ও মতবাদ*। বাঙলায়ন প্রকাশ, ঢাকা।

সরিফা সালোয়া ডিনা (২০১০)। *হাসান আজিজুল হক ও আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্প : বিষয় ও শিল্পরূপ*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

হাসান আজিজুল হক (২০০১)। *রচনাসংগ্রহ*। জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা।

(২০১৬)। *গল্পসমগ্র-১*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

(২০১১)। *গল্পসমগ্র-২*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

হায়াৎ মামুদ (সম্পা., ২০১১)। *উন্মোচিত হাসান : হাসান আজিজুল হকের আলাপচারিতা*। জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা।